www.priofaridpur.com

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ

১৯৪৩ সাল

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার সালামতপুর (রউফ নগর)

মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ। তাঁর বাবা ছিলেন মুন্সি মেহেদী হোসেন । তিনি ছিলেন গ্রামের মসজিদের ইমাম। মা মুকিদুন্নেছা । সাক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন স্ত্রী মুকিদুন্নেছা, এক ছেলে মুন্সি আব্দুর রউফ এবং দুই মেয়ে জহুরা ও হাজেরাকে নিয়ে মুন্সি মেহেদী হোসেনের সংসার। বাবার কাছেই মুন্সি আব্দুর রউফের লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছিলো ।

অসম্ভব সাহসী ও মেধাবী রউফের লেখাপড়ার প্রতি মোটেই ঝোঁক ছিলো না । মা একদিন তাঁকে পড়তে বসার জন্য বললেন । কিন্তু ছেলে রউফ পড়তে না বসে গাছের পাখিদের সাথে মিতালিতে ব্যস্ত হয়ে গেল। এই দেখে মা ছেলেকে দিলেন বকা। ছেলেও অভিমানে ঘর থেকে বের হয়ে দিলেন দৌড়। ছেলে ছুটছে, মা-ও পেছন পেছন ছুটছেন ছেলেকে ধরার জন্য । ছুটতে ছুটতে একেবারে মধুমতি নদীর কিনারে । পাড়ে দাঁড়িয়ে মাকে দৃঢ় স্বরে বললেন, আমাকে ধরতে এলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ব কিন্তু । মায়ের রক্ত হিম হয়ে এলো। ছেলের এই জেদী রূপ মা এর আগে দেখেননি কখনো। এরপর মা গলার স্বর নরম করে ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। আর কোনদিন তাঁকে তিনি বকাঝকা করেননি। মুন্সি আব্দুর রউফের বাবা মুন্সি মেহেদী হোসেন হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেন। মুন্সি আব্দুর রউফের বয়স তখন খুবই অল্প । স্বামীর মৃত্যুর পর এক ছেলে আর দুই মেয়ে জহুরা ও হাজেরাকে নিয়ে মা মুকিদুন্নেছা অকূলপাথারে পড়েন। নিত্য অভাবের মধ্য দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন তিনি। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়ির কাঁথা সেলাই, শিকে তৈরি করার কাজ নেন। এমনিভাবে মুকিদুন্নেছা দুঃখের দীর্ঘতম দিনগুলি একটি একটি করে পাড়ি দেন। সাথে থাকে ছেলেমেয়েকে বড় মানুষ করার স্বপ্ন । বাবার মৃত্যুর পর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতে থাকে আব্দুর রউফের জীবনাচারেও । আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে তাঁর দুরন্তপনা । লেখাপড়ার প্রতি মনযোগ বাড়ে । এর ফলে মেধাবী বলে তাঁর সুনামও হয়। গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুল শেষ করার পর ভর্তি হন থানা শহরের হাইস্কুলে । এই সময়ে প্রায়ই মায়ের দুঃখ কষ্ট দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। ভাবতেন কী করে মায়ের কষ্ট লাঘব করা যায় । এতটুকুন ছোট ছেলে কী আর করতে পারেন তিনি? তবে চাচার কাছে শুনেছেন সপ্তম শ্রেণী পাশ করতে পারলে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারবেন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় এলো সেই সুযোগ। ১৯৬৩ সালের মে মাসে আব্দুর রউফ যোগ দেন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এ । সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েও রউফের মন ছিলো বাড়ির দিকে। নিয়মিত মাকে টাকা পাঠাতেন এবং চিঠি লিখতেন। ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝেই বাড়ি চলে আসতেন।

১৯৭১ সালে রউফ এক চিঠির উত্তরে মাকে লিখেছিলেন, এখন একটু কাজের ব্যস্ততা বেড়েছে, তাই আগের মতো ঘন ঘন ছুটি পাই না। তার জন্য তুমি চিন্তা করো না মা, ছুটি পেলেই বাড়ী আসবো তখন ছোট বোনের বিয়ে দিবো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে মুন্সি আব্দুর রউফ চট্টগ্রামে ১১ উইং-এ চাকরিরত ছিলেন। তিনি ছিলেন মাঝারি মেশিনগান ডিপার্টমেন্টের ১ নং মেশিনগান চালক। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হন। সেদিন, ৮ এপ্রিল ১৯৭১। গনগনে মধ্য দুপুরের এক বিশেষ মুহূর্ত। সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিচ্ছে। নীরব-নির্জন হ্রদের বুক চিরে শান্ত পানিতে অস্থির ঢেউ তুলে এগিয়ে আসতে লাগলো সাতটি স্পিডবোট এবং দুটো লঞ্চ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দুই কোম্পানি সৈন্য। তাদের সঙ্গে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্র। এটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের কোম্পানি। লক্ষ্য বুড়িঘাটের মুক্তিবাহিনীর নতুন প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। লক্ষ্যের দিকে তীব্রগতিতে ছুটে আসছে দুটি স্পিড বোট এবং দুটি লঞ্চ। এগুলোতে রয়েছে ছয়টি তিন ইঞ্চি মর্টার আর অনেক মেশিনগান এবং অনেক রাইফেল। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছেই পাকিস্তান বাহিনী শুরু করলো আক্রমণ। স্পিড বোট থেকে ক্রমাগত চালাতে লাগলো মেশিনগানের গুলি আর লঞ্চ দুটো থেকে ছুটে আসছে অবিরাম তিন ইঞ্চি মর্টারের শেল। মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগলো গুলির পর গুলি। গোলাগুলির প্রচন্ড শব্দে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো। যুদ্ধের এই পর্যায়ে প্রতিরক্ষা ঘাঁটির কমান্ডার মুন্সি আব্দুর রউফ দেখলেন যে, এভাবে কিছুক্ষণ চলতে থাকলে ঘাঁটির সকলেই মারা পড়বেন। তিনি তখন কৌশলগত কারণেই পশ্চাদপসারণের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সিদ্ধান্তের কথা সৈন্যদের জানানো মাত্র সৈন্যরা যে যেভাবে পারে পিছু হটতে লাগল। মুন্সি আব্দুর রউফ দেখলেন, শত্রু এগিয়ে এসেছে খুব কাছে আর এভাবে সকলে একযোগে পিছু হটতে চাইলে একযোগে সকলেই মারা পড়বে। কাভার দেওয়ার জন্যে কাউকে না কাউকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি পিছু হটলেন না। কাভার দেওয়ার জন্য নিজ পরিখায় দাঁড়িয়ে গেলেন মুন্সি আব্দুর রউফ স্বয়ং। অসম্ভব সাহসে, দৃঢ়চিত্তে মেশিনগানটি উঁচুতে তুলে ফেললেন। অনবরত গুলি করতে লাগলেন পাকিস্তানি স্পিড বোটগুলোকে লক্ষ্য করে। প্রচন্ড সাহসের সঙ্গেই তিনি কাজে লাগালেন পাকিস্তান রাইফেলসে কাজ করার অভিজ্ঞতা। পাকিস্তানি হানাদারদের তিনি পথ ছেড়ে দিতে রাজি নন। শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে একাই লড়তে লাগলেন এই অকুতোভয় বীর। ল্যান্স নায়েক আব্দুর রউফ এক একটা স্পিড বোটকে লক্ষ্য স্থির করে মেশিনগান দিয়ে অবিরাম গুলি বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁর প্রচন্ড গুলিবৃষ্টিতে থমকে গেল শত্রুরা। তারা প্রত্যাশাও করেনি এমন পাল্টা আক্রমণ হতে পারে। রউফের গুলি খেয়ে একের পর এক শত্রুসেনা লুটিয়ে পড়তে লাগলো। একটি একটি করে সাতটি স্পিড বোটই ডুবে গেল। এমন পর্যায়ে শত্রু সেনারা তাদের দুটি লঞ্চ নিয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। পিছু হটতে হটতে দুটো লঞ্চই চলে গেল রউফের মেশিনগানের গুলির আওতার বাইরে নিরাপদ দুরত্বে। হানাদার বাহিনী এবার তাদের লঞ্চ থেকে শুরু করলো মর্টারের গোলা বর্ষণ। তারা লক্ষ্য স্থির করল, যেভাবেই হোক থামিয়ে দিতে হবে মুক্তিবাহিনীর মেশিনগানটাকে। একের পর এক ক্রমাগত মর্টারের গোলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রউফের একার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। শত্রুর একটি মর্টারের গোলা হঠাৎ এসে পড়ে তার বাঙ্কারে। মর্টারশেলে ঝাঁঝড়া হয়ে যায় তাঁর সমস্ত শরীর। থেমে গেলেন তিনি। হাত থেকে পাশে ছিটকে পড়ল মেশিনগান। ততক্ষণে তাঁর সহযোগী যোদ্ধারা সবাই পৌঁছে যেতে পেরেছে নিরাপদ দুরত্বে। প্রকৃত বন্ধুর মতো একটি মাত্র মেশিনগান দিয়ে একই সঙ্গে শত্রুদের ঘায়েল করলেন এবং সহযোদ্ধাদের রক্ষা করলেন। তিনি বাংলার শোণিতাক্ত সূর্যের সঙ্গে মিশে গেলেন। মায়ের বুক খালি হলো, বোনের জন্য বিয়ের শাড়ি নেওয়া হলো না, অথচ নিজের বুকের আলো দিয়ে উজ্জ্বল করলেন তিনি স্বাধীনতার পথ। হয়ে গেলেন অমর, বীর, শহীদ, বীরশ্রেষ্ঠ। চির রুদ্রের প্রতীক এই বীরকে সমাহিত করা হয়েছিলো রাঙামাটি শহরের রিজার্ভ বাজারে কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারের পাশে। ১৯৯৬ সালে রাঙামাটিবাসী প্রথম জানতে পারে, এ চিরসবুজ পাহাড়ের মাঝেই ঘুমিয়ে আছেন বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ। ফরিদপুরের এই বীরশ্রেষ্ঠ এঁর নামে তাঁরই গ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ স্মৃতি যাদুঘর ও পাঠাগার। তিনি আমাদের ফরিদপুরের অহংকার।

[ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত, লেখক: মোহাম্মদ ইলিয়াছ চৌধুরী]